Vol. 1, Issue 236

সকালবেলা

সোমবার, ৭ মাঘ, ১৪১৯ ● ২১ জানুয়ারি, ২০১৩

ভোট চিন্তন

শতবর্ষ প্রাচীন রাজনৈতিক দল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এতদিনে দলের ভেতর যে গণতন্ত্র নেই, শৃঙ্খলা নেই এ কথাটা অনুধাবন করতে পেরেছে। জয়পুর কংগ্রেসের চিন্তন শিবিরে শীর্ষ নেতারা ব্যক্ত করলেন নিজেদের অভিমত। এবং বুঝতে পারলেন যে দলীয় কাজকর্মে শৃঙ্খলা আনতে গেলে গণতন্ত্র চাই। এই চিন্তন শিবিরেই রাহুল গান্ধীকে ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে দলের মুখ হিসেবে তুলে ধরতে চেয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন নেতারা। বয়স তার যাই হোক না কেন রাহুল চলনে-বলনে অন্তত কংগ্রেসিদের কাছে যুবনেতা তো বটেই। কংগ্রেসের তরুণ তুর্কিদের নিয়ে তিনি একটি ব্রিগেডও গড়েছেন। এই বিগ্রেডের রাজনৈতিক পারিভাষিক নাম রাহুল ব্রিজেড। সারা দেশ থেকে নিজের উদ্যোগে বাছাই করে পছন্দসই তুর্কিদের নিয়ে তরুণ প্রজন্মের এই ব্রিগেড গড়েছেন রাহুল। পাকেচক্রে এই রাহুল ব্রিগেডে ত্রিপুরারও দুই তুর্কি রয়েছেন বলে জানা যায়। প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মণ (যাকে মহারাজা বলেও ডাকা হয়) এবং বাপ্টু চক্রবর্তী না কি এই রাহুল ব্রিগেডের সদস্য। ত্রিপুরার কংগ্রেস রাজনীতিতে প্রদোৎবাবুর অবদান এখনও সেভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। এমনকী রাজ্য কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাজকর্মেও প্রকাশ্য তাকে দেখা যায় না। তিনি আছেন মঞ্চের অন্তরালে। আর বাপ্টু চক্রবর্তী কংগ্রেসের যুব রাজনীতিতে একটি ডাকসাইটে নাম। রাজ্য কংগ্রেসে এখন বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া নিয়ে চলছে গৃহবিবাদ। এই বিবাদ সদর পূর্বের খয়েরপুর কেন্দ্রকে ঘিরে একেবারে চরমে উঠেছে। প্রদেশ কংগ্রেস প্রথম যে 'চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা' (যা এখনও চূড়ান্ত নয়) প্রকাশ করেছিল তাতে খয়েরপুর কেন্দ্রে প্রাক্তন মন্ত্রী বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা রতন চক্রবর্তীর নাম ঘোষণা করা হয়। কিন্তু রতনবাবুর প্রার্থীপদের মাঝপথে বাগড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন বাপ্টুবাবু। রাহুল ব্রিগেডের সদস্য হওয়ার জোরে খয়েরপুরে শেষ পর্যন্ত প্রার্থী হওয়ার সিকে ছিঁড়ল বাপ্টু চক্রবর্তীরই ভাগ্যে। কিন্তু সুখ সইল না। সঙ্গে সঙ্গে একদিনেই খয়েরপুরে রতন চক্রবর্তীর অনুগামী কংগ্রেস কর্মীরা দলে দলে যোগ দিয়ে ফেলল শাসক দল সিপিএমে। রতনকে কেটে বাপ্টুকে এনে যেন খাল কেটে কুমির নিয়ে এল কংগ্রেস হাইকমান্ড। খয়েরপুরে সিপিএম প্রার্থী পবিত্র করের ঝোলায় এতে আরও বেশ কিছু ভোটারের ভার বেড়ে গেল। এই কেন্দ্রটিতে পবিত্রবাবু পরপর চারবারের বিধায়ক। রতনবাবু বনমালীপুর কেন্দ্র ছেড়ে খয়েরপুরে দাঁড়ানোর পর একবারের জন্যও জিততে পারেননি। আর এবার বাপ্টুর ধাক্কায় শুধু রতনবাবুই কাত হলেন না, উপরন্তু পবিত্র করের জয় যেন না বলতেই এসে গেল হাতের মুঠোয়। এই হল কংগ্রেসের রাহুল ব্রিগেডের মহিমা। অর্থাৎ ২০১৪-য় লোকসভা নির্বাচনে রাহুলের নেতৃত্বে কংগ্রেস লড়াই করবে বলে চিন্তন শিবিরে যেভাবে রাহুলকে অভিষিক্ত করা হল তা শুরুতেই একটা শক্ত হোঁচট খেল। আর এই হোঁচটের সূচনা হল ত্রিপুরা থেকেই। দেশের আর সব রাজ্যের মতো ত্রিপুরায়ও প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হওয়া নিয়ে গোষ্ঠীবাজি, বিশৃঙ্খলা এবং অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়। এটা অবশ্য কংগ্রেসের পুরনো কালচার। সেই মহাত্মা গান্ধীর আমল থেকেই চলে আসছে। ১৯৩৮-এ হরিপুরায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে বাংলা কংগ্রেসের যে সময়কার উজ্জ্বল প্রতিনিধি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু সভাপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার পর গান্ধীজি একেবারে রাগ করে বেঁকে বসেছিলেন। সভাপতি নির্বাচনে হেরে যান গান্ধীজির মনপছন্দ প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়া। গান্ধীজি তখন বলেছিলেন, 'সীতারামাইয়ার পরাজয়, আমার পরাজয়'। অর্থাৎ নেতাজির জয়কে মেনে নিতে পারেননি গান্ধীজি। অবশেষে নেতাজি সুভাষ কংগ্রেস ছাড়তে বাধ্য হন এবং গঠন করেন ফরওয়ার্ডব্লক। এটা এখন ইতিহাস। কিন্তু কংগ্রেস দল হিসেবে এই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়নি। নেহরু-গান্ধী পরিবারের ধামাটিও ধরে রেখেছে যথারীতি। ধরা যাক, চিন্তন শিবিরের ফমুর্লা অনুযায়ী কংগ্রেসের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত সভাপতি এবং সম্পাদকদের নির্বাচনের ব্যাপারে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসৃত হল। কিন্তু তাতেও কি সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারবে কংগ্রেস? নেতাজি বনাম সীতারামাইয়া নাট্যের কি পুনরাবৃত্তি হবে না ফের এবং বারবার? কোনও একট রাজ্যে প্রদেশ সভাপতি নির্বাচনে যদি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কেউ জয়ী হয় এবং তিনি যদি হাইকমান্ডের পদলেহনে রাজি না হন তাহলে ওই ব্যক্তিত্বকে কি শেষপর্যন্ত মেনে নেবে না হাইকমান্ড? রাহুল ব্রিগেড ত্রিপুরায় প্রার্থী পদ নিয়ে শেষ পর্যন্ত যে খেলটা দেখাল তার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নগুলি উঠে আসবেই। ওই দিল্লি কেন্দ্রিক হাইকমান্ডই হয়ে উঠেছে কংগ্রেসের কাল। কংগ্রেসের ভেতর যদি নেতৃত্বের ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ না করা হয় তাহলে কংগ্রেসের অন্তর্জলিযাত্রা রোধ করা কঠিন। ইতিহাসের নিরিখে এটাই আজ বাস্তব। হরিপুরা থেকে ত্রিপুরা সর্বত্রই কংগ্রেসের কালচার একই ট্র্যাডিশনে চলছে।

গাহি তব জয়গাথা

● ওঙ্কাররূপী মন্ত্ররাজকে ভৈরবনিনাদে উচ্চারণ করে পীঠদেবীকে প্রার্থনা করতে হবে। দেবীকে তপস্যার বলে ওঙ্কার বিগ্রহে রূপবতী করে প্রত্যক্ষ দর্শন করা।

৫১ পীঠদর্শনের জন্য রেল কোম্পানিকে পারের কড়ি গুনে দিয়ে তীর্থদর্শন করতে হয় অথচ নিজেদের গৃহে পতিপরায়ণা রমণীর সমগ্র দেহের প্রত্যেকটি রোমকূপে এক একটি তীর্থ বিরাজিত। যোগদৃষ্টি উন্মেষিত করে সেই তীর্থ দর্শন করলে, অভ্যাসের শক্তিতে ওঙ্কাররূপী সদ্‌গুরুর অবস্থিতি সেখানে অনুভব করা যায়।

● প্রণবের গভীর আওয়াজে তীর্থদেবতার বন্দনা কর, কামজিৎ হও, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারী হও, নারীর সর্বদেহে সদ্‌গুরু দর্শনের এই প্রয়াসই জানিও সকল তপস্যার শ্রেষ্ঠ তপস্যা।

● নামের স্বরূপ— নামকে শুধু একটা শব্দমাত্র মনে করো না। মনে করবে তেজঃস্বরূপ জ্যোতির্ময় মহারাজ বলে, নাম হচ্ছেন শ্রীভগবানের দেহ।

— শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

কলেমার দাওয়াত

এই আসবাবের ভুল এক্কিনের পথ থেকে দাওয়াতের কাজ ছাড়া বের করা যাবে না। সর্বদা আমল ও আসবাবের মধ্যে মোকাবেলা হবে, আমার দোস্তগণ, আসবাব ও আমলের মোকাবেলাতে এক্কীন কারীরা সফল হবে আর এক্কীন তৈরি হবে একমাত্র দাওয়াতের মাধ্যমেই। দাওয়াতের কাজ ছাড়া এক্কীন তৈরি হবে না, কারণ দাওয়াতের তাকাজা বা তাগিদই হোল ভুলপথের বিরুদ্ধে বলা। এটাই হোল দাওয়াতের তাকাজা, কলেমার দাওয়াতই হোল ভুল পথের বিরুদ্ধে।

— মওলানা সা'আদ কান্ধলুবী মাদ্দাজিল্লাহুল আলি

বাইবেলের বাণী

● এসব কথা তোমাদেরকে বললাম, যেন তোমরা বাঁধা না পাও। লোকে তোমাদেরকে সমাজ থেকে বের করে দেবে; এমনকী, সময় আসছে, যখন যে কেউ তোমাদেরকে বধ করে, সে মনে করবে আমিই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উপাসনাবলি উৎসর্গ করলাম তারা এসব করবে, কারণ তারা না পিতাকে, না আমাকে জানতে পেরেছে।

— যোহন ১৬ঃ ১-৩

সার্ধশত জন্মদিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য

শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ

নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাখালচন্দ্রের যে আলাপচারিতা তা অধিকতর ঘনিষ্ঠ হয়েছিল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে।

লিখেছেন **অলক মণ্ডল**

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'রাখাল আসিবার পূর্বে দেখিতেছি মা একটি বালককে সহসা আমার ক্রোড়ে বসাইয়া বলিতেছেন—'এইটি তোমার পুত্র'। শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম, 'সে কি? আমার আবার ছেলে?' তিনি তাহাতে হাসিয়া বুঝাইয়া দিলেন, 'সাধারণ সাংসারিকভাবে ছেলে নয়, ত্যাগী মানসপুত্র'।

শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালচন্দ্রকে অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দকে মানসপুত্র হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন এবং আমরা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে দেখতে পাই রাখালকে ঘিরে তাঁর বাৎসল্যভাবের বহুল প্রকাশ। শ্রীম-র মনে হয়েছে সেই বাৎসল্যভাবের প্রকাশ যেন যশোদা-গোপাল সম্পর্কটির মতো। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবমুখে বলেছেন, 'মা তোমাকে বলেছিলাম— একজনকে সঙ্গী করে দাও আমার মতো। তাই বুঝি রাখালকে দিয়েছো'। রাখাল সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলেছেন, 'কীর্তন শুনতে শুনতে রাখালকে দেখেছিলাম ব্রজমণ্ডলের ভেতরে রয়েছে'। ১৮৮২ সালের ১১ মার্চ শ্রীম লিখিত বিবরণে পাই—'রাখালচন্দ্র বাহ্যজ্ঞানশূন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বুকে হাত দিয়ে বলছেন—'শান্ত হও, শান্ত হও'। স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ মহেন্দ্র নাথ দত্তের লেখাতেও পাই--- শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসার পর থেকে রাখালের ভাবান্তর প্রসঙ্গ।

রাখাল (ব্রহ্মানন্দ) ও নরেন (বিবেকানন্দ) সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন—'রাখালের সাকারের ঘর,নরেনের নিরাকারের। রাখাল ও নরেনকে খাওয়ালে নারায়ণকে খাওয়ানো হয়। এরা সামান্য নয়— এরা ঈশ্বরাংশে জন্মেছে এরা নিত্যসিদ্ধ ও ঈশ্বরকোটি'।

শ্রীরামকৃষ্ণের দুই অন্তরঙ্গ ঈশ্বরকোটি পার্ষদ হলেন— স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মানন্দ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের আবাল্য অকপট বন্ধু-আজীবন উভয়ে ছিলেন অচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ এবং অসাধারণ ধৈর্য ও সহ্যশক্তির প্রতীক।

ব্রহ্মানন্দের জন্ম অবিভক্ত ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বাসিরহাট মহকুমার শিকড়া কুলীন গ্রামের জমিদার পরিবারে ১৮৬৩ সালের ২১ জানুয়ারি (বাংলা ১২৬৯ সালের ৮ মাঘ)। অর্থাৎ রাখাল নরেনের চেয়ে মাত্র নয়দিনের ছোট ছিলেন। বাড়ির নিকট পড়াশোনা শেষ হলে রাখালকে ১৮৭৫ সালে ইংরাজি শিক্ষার জন্য সিমলার কাছে কলকাতা ট্রেনিং একাদেমিতে পাঠানো হয়েছিল। ট্রেনিং-একাদেমির নিকট ব্যায়ামাগারে 'খাপখেলা তরোয়াল' নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাখালচন্দ্রের প্রথম আলাপ হয়েছিল। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাখালচন্দ্রের যে আলোপচারিতা তা অধিকতর ঘনিষ্ট হয়েছিল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে তাঁদের প্রেম সম্পর্ক দাঁড়ায় 'হরিহর আত্মার মতো। রাখাল চন্দ্রের দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে ১৮৮১ সালের জুন/জুলাই মাসে আসার তিন/চার মাস পরেই নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট এসেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নবযুগের সেই মহাদ্যুতি, নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি পার্ষদেরা তাঁর সেই লোকোজ্জীবনী দীপ্তিকে বিচ্ছুরিত করার ভার নিয়েই এসেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মানসনয়নে যে পুত্রকে দেখেছিলেন-সেই পুত্র, একদিন তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়েছিলেন সশরীরে। রাখালকে প্রথম দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণ চমকে উঠেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মানসপুত্রটিকে পেয়ে মায়ের স্নেহে কোলে বসিয়ে ক্ষীর, সর, ননী খাওয়ান, তাকে কাঁধে চড়িয়ে বেড়ান। ঠাকুর শ্রীশ্রী মায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে বলেন—'এই নাও তো—তোমার ছেলে এসেছে। মা সন্দেশ খাওয়ালেন, কত যত্ন করে। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরেই শোয় রাখাল।

রাখালচন্দ্র ঠাকুরের ত্যাগী মানসপুত্র, তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির ভাবী উত্তরাধিকারী। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দেহত্যাগের কয়েকদিন আগে ভাবী রামকৃষ্ণ সংঘ চালাবার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্রহ্মানন্দকে চিহ্নিত করেন। স্বামীজির দেহান্তরের পর রামকৃষ্ণ সংঘের পরিচালনা ও অগ্রগতির মুখ্য দায়িত্ব তিনি যেভাবে পালন করে গিয়েছেন আজ প্রায় সমগ্র বিশ্বে এর প্রসার ও ব্যাপ্তি সম্ভব হয়েছে। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র এবং লীলাসহচর সাধকশ্রেষ্ঠ এবং সংঘগুরু ব্রহ্মানন্দের নাম শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের মতো বাংলার আবালবৃদ্ধ বণিতার কাছে সুপরিচিত নন। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন---'আধ্যাত্মিকতায় (Spirituality) রাজা আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো।' তাই তো স্বামীজি শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সমস্ত দায়িত্ব অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁকে অর্পণ করে নিশ্চিত হয়েছিলেন। 'রাজা মহারাজ' তাঁরই দেওয়া আদরের নাম। ভক্তদের সঙ্গে ধর্মালোচনা এবং নিজের ধ্যান ধারণা ছাড়া রাজা মহারাজের প্রধান কর্তব্য ছিল— শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও বাণী প্রচার করা। স্বামীজি যে কাজ বহির্ভারতে আরম্ভ করেছিলেন, রাজা মহারাজ সেই কাজ স্বদেশের সর্বত্র পালন করতে উদ্যোগী হন। স্বামীজি বুঝেছিলেন— শ্রীরামকৃষ্ণকে সংঘকে স্থায়ী ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে একমাত্র রাজা মহারাজাই সক্ষম। তাই তাঁকে লিখেছিলেন, এমন মেশিন খাড়া করো যে আপনি আপনি চলে যায়, যে মরে বা যে বাঁচে। বহুদিন নির্জন তপস্যায় কেটেছে ধর্মবীর ব্রহ্মানন্দের। কর্মবীর ব্রহ্মানন্দ হিসাবে দেখা দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ বিশাল-জনসমুদ্রের মাঝখানে চিত্তনির্দেশকে আলোকসজ্জা রূপে। স্বামী সারদানন্দ বলেছিলেন--- 'মহারাজ ও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। মহারাজ ছিলেন আমাদের পরিচালক, কিন্তু মঠের অধ্যক্ষপদের কর্তৃত্ব দ্বারা নয়, তিনি আমাদের পরিচালনা করতেন— তাঁর প্রেমের বশীকরণ শক্তির দ্বারা। শ্রীরামকৃষ্ণভাবের নবরূপকার স্বামী ব্রহ্মানন্দ সকল দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সহযোগী সারদানন্দ প্রমুখ গুরুভাইদের সঙ্গে মিলিতভাবে চালিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দভাবের প্রয়োগ। এক শ্বেতাঙ্গ ভক্তকে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন---'এখানে একটা ডায়নামো চলছে। আমরা সকলে তার অধীনে আছি।'

স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও অন্যান্য সতীর্থদের সঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ

আমৃত্যু (১৯২২ সালের ১০ এপ্রিল পর্যন্ত) মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট ব্রহ্মানন্দ হরিদ্বার, প্রয়াগ, কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি উত্তরভারতের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলির উন্নতিসাধন, দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি নতুন কেন্দ্র স্থাপন, কাশীতে স্বামীজি প্রতিষ্ঠিত একটি অনার্থ আশ্রমের (রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম) দায়িত্ব তিনি পালন করেছিলেন। বেলুড়মঠ যেমন স্বামী বিবেকানন্দের অদ্বিতীয় কীর্তি, তেমনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের কীর্তি ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মঠ।

দক্ষিণ ভারতের খুবই জনপ্রিয় রামনাম সংকীর্তন ব্রহ্মানন্দ বেলুড় মঠে প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে তিনি জুড়ে দিয়েছিলেন কয়েকটি তুলসীদাসের দোঁহা। তিনি সন্ন্যাসীদের প্রত্যেক একাদশী ও রাম নবমীর দিনে এই সংকীর্তন করতে বলেন। বর্তমানে রামনাম সংকীর্তন শুধু বেলুড়মঠে নয়, রামকৃষ্ণ সংঘের সকল কেন্দ্রে একাদশীর দিন গাওয়া হয়।

যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তপস্যার হোমাগ্নিশিখা ব্রহ্মার পুরুষ ব্রহ্মানন্দ নিজ জীবনে গ্রহণ করেছিলেন। অসীম নিষ্ঠার সঙ্গে সাগ্নিক ব্রাহ্মনের মতো আজীবন তা প্রজ্বলিত রেখেছিলেন এবং শত শত মুমূর্ষু মানব-মানবীর অন্তরে আত্মীয়ের ভালোবাসা নিয়ে সেই পুণ্যাগ্নি শিখা সঞ্চারিত করেছিলেন। তিনি একাধারে সাধক এবং সিদ্ধপুরুষ। ধর্মগুরু এবং ধর্মবীর যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব সৃষ্টি এবং যুগাদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের অন্যতম স্রষ্টা। স্বামীব্রহ্মানন্দের শুভ জন্মের সার্ধশতবর্ষে প্রণতি নিবেদন করি।

লেখক গল্পকার

ক্যাম্পাস বিট

নবমে ছাত্র-ছাত্রীরা আটকে যাচ্ছে কেন?

নিজের ফলাফলের জন্য অন্যদের দোষ দেওয়া কেন

দেবব্রত কর

আমরা নবম শ্রেণির পরীক্ষায় যে ফলাফল করেছি সামনে মাধ্যমিকে এর প্রভাব পড়বেই। একমাত্র উপায় ভাল পড়াশোনা। স্কুলে পড়ানো হয়েছে ঠিকই। কিন্তু নিজেদের গাফিলতির কারণে এধরনের ফলাফল হয়েছে। অন্যদেরও একই কারণে ফলাফলের এই অবস্থা। অষ্টম থেকে নবমে উঠার সময়ে নম্বর ভালই ছিল। এবার বার্ষিক পরীক্ষায় ৭০০-তে ২৬৬ পেয়েছি। আগের তুলনায় এটা কমই। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল এখন নেই। আমার মনে হয় না আমাদের এবারের ফলাফল-এ এর কোনও কুপ্রভাব আছে। কারণ নতুন আইনের সামনাসামনি হয়েছি অষ্টমে ওঠে। ছাত্রছাত্রীরা আগে পড়াশোনা করেই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এসেছিল। তাই এবারও পড়াশোনা করেই দশমে উঠেছে। যারা নবমে আটকে গিয়েছে তারা নিজেদের গাফিলতির জন্যই। এর জন্য নতুন আইনকে দোষ দেওয়ার মতো কিছুই নেই। এখন সবারই প্রাইভেটে টিউটর থাকে। তাই প্রাইভেট টিউটর থাকার পরও ফলাফল এরকম সত্যিই চিন্তাজনক। আমি নিজের কথাও বলছি। বাড়ি-ঘর থেকে সব সময়ই বলা হয়েছিল ঠিক মতো পড়তে। সেসব কথা ঠিকভাবে নিতে পারিনি বলেই এই অবস্থা। মাধ্যমিকের আগে ভালভাবে পড়তে হবে। তা হলে সেখানেও ফল খারাপ হতে পারে। আমি নিজেও যেমন সেদিকে নজর রাখব, অন্যদেরও বলব এখনই পড়াশোনায় নজর দিতে। অন্য স্কুলের মতো আমাদের স্কুলেও নবমের ফলাফল ভাল হয়নি। স্যার-ম্যাডামদের এর জন্য দোষ দেওয়া ঠিক নয়।

দেবব্রত প্রাচ্যভারতী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র।
শ্রুতিলিখন ঃ সমীরণ মজুমদার

রাজ্যে সৌরবিদ্যুতের বাস্তব সম্ভাবনা কতটা?

সৌর বিদ্যুৎ কি সত্যিই বিকল্প হয়ে উঠছে নাকি শুধুমাত্র সহায়ক শক্তি? রাজ্যের কয়েকটি প্রাতিষ্ঠানিক ও গুচ্ছ গ্রামের সীমায়িত সৌর বিদ্যুতের প্ল্যান্ট ঘুরে এসে লিখেছেন **সুমন ভট্টাচার্য।**

বিশ্ব জুড়ে লক্ষ-কোটি শিল্প-কল-কারখানা থেকে উপজাত গ্যাস-ধোঁয়া, বৈদ্যুতিক ভোগ্য পণ্যের লক্ষ লক্ষ উপাদানের বেহিসাবি ব্যবহার এবং একই সঙ্গে বন ধ্বংসের কারণে বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাস, বিশেষত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ঘন আস্তরণ ভূউষ্ণায়ন ও আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রধান ও একমাত্র কারণ। প্রধানত কার্বনের যথেচ্ছ নির্গমন ঠেকাতে বিশ্বজুড়ে প্রয়োগ শুরু হয়েছে অপ্রথাগত শক্তির ব্যবহারের। যার অন্যতম হলো সৌরশক্তির ব্যবহার। কিন্তু কতটা বাস্তবিক সম্ভাবনা আছে সৌর শক্তির বিদ্যুতের? বছর তিনেক আগে রাজ্যের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী উদ্বোধন করেন লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ির বাঁদিকে সৌর আলোকিত বাগানের। সন্ধ্যায় সদর রাস্তা থেকে গোলাকৃতি বাতিগুলো দেখতে ভালোই লাগে। কিন্তু এই বাগানে পুণ্যার্থী বা সাধারণ পর্যটকের আনাগোনা তো চোখে পড়ে না। তাহলে চল্লিশটার মতো বাতি লাগানোর উপযোগিতা কোথায়? উপযোগিতার জায়গা বোধ হয় একটাই সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার সম্পর্কে মানুষকে জানান দেওয়া। সেখানে অর্ধেকেরও কিছু কম সংখ্যার বাতি জ্বলে না। কিছুদিন আগে বেশ কিছু সৌর আলোর যন্ত্রাংশ খোয়া গিয়েছে। মন্দির কর্তৃপক্ষ থেকে চিঠি দেওয়ার পরও শর্ত অনুযায়ী বিকল বাতিগুলো সারাই করছে না পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা, এ নিয়ে আক্ষেপ করলেন মন্দির কর্তৃপক্ষ। প্রসঙ্গত, ৪০টি বাতির প্রত্যেকটি ১১ ওয়াট করে ৪৪০ ওয়াট সৌর আলো দেওয়ার কথা। প্রাকৃতিক গ্যাসে ১৩০ মেগাওয়াট উৎপাদন করছে রামচন্দ্র নগরের নিপকো পাওয়ার প্ল্যান্ট। তাপবিদ্যুৎ স্বভাবতই বাতাসে কার্বন গ্যাস নির্গমনের সহজ ও সাধারণ এক ঠিকানা। এই নিপকো তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকায় নিরাপত্তার কথা ভেবে গুরুত্বপূর্ণ চারটে এলাকার রাস্তা আলোকিত করার জন্য তাপবিদ্যুতের আলোর সঙ্গে সমানতালে লাগানো হয়েছে সৌরবাতি। বিকল্প শক্তিকে, অমূল্য রতনের মতোই ব্যবহার করার উদ্যোগ নিয়েছে নিপকো। এ প্রসঙ্গে এখানকার প্রকল্প প্রধান সুব্রত সাহা জানান, প্ল্যান্ট এলাকায় বড় ধরনের 'পাওয়ার ফল্ট' হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৌরবাতিগুলো জ্বলে উঠবে। তিনি জানান, গত বছর ত্রিপুরা পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা থেকে তিরিশ থেকে চৌত্রিশ হাজার টাকা করে পয়েন্ট পিছু খরচে লাগানো হয়েছে। প্রতিটিতে ১১ ওয়াট ক্ষমতার সিএফএল বাতি ঘটনাচক্রে দু'তিনবার জ্বলেছে, মূলত ঃ তাপবিদ্যুৎ ফেল করেছিল বলেই, তাঁর মতে সৌর বিদ্যুতের উপযোগিতা 'আনপ্যারালাল'। তাপবিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ নিয়ে উত্তরপূর্বাঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের 'কাণ্ডারি' নিপকো সম্ভবত একারণেই সৌরশক্তি নিয়ে আরও উৎসাহী। তবে উৎপাদন নয়, প্ল্যান্টের সুরক্ষার কথা ভেবেই তারা এগুচ্ছেন। আরও একটু ভেঙে বলা থাক, মনারচকে নিপকো ১০১ মেগাওয়াটের নতুন একটি গ্যাসভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদন করতে চলেছে। সেখানেও বিশেষ করে 'ফল্ট' হয়ে তাপবিদ্যুতের আলো না থাকলে প্রকল্প এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে আলোর ব্যবস্থা রাখতে ১ কিলোওয়াট ক্ষমতার সৌর প্ল্যান্ট বসানোর উদ্যোগ নিচ্ছে নিপকো। কার্বন নির্গমনের কারণে অপেক্ষাকৃত সুলভ উপায় 'ডিজেল' প্ল্যান্ট-এর কথা তারা আর ভাবছেনই না।

রাজধানীর বুকে রাজ্যের প্রাচীনতম ও এক সময়ে প্রসূতি মাতৃ এবং শিশু কল্যাণের প্রধান হাসপাতাল ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালে বেশ কয়েক বছর আগেই গরম জলের জন্য বসানো হয়েছিলো সৌরশক্তির প্যানেল। স্বাভাবিকভাবেই তখনকার ব্লক টু বা পোস্ট অপারেটিভ ওয়ার্ডের ছাদে তা লাগানো হয়। ২০০৫ পর্যন্ত টানা ৫ বছর ত্রিপুরা রাজ্য পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থার (ট্রেডা) লাগানো বিনা খরচের প্যানেল এই ব্যস্ততম জরুরি বিভাগটির উষ্ণ জলের চাহিদা পূরণ করে গিয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিনের অযত্ন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার অনীহার কারণে প্যানেলগুলোর যন্ত্রাংশ ধীরে ধীরে বিকল হয়ে পড়ে।

গত কয়েক বছরে হাসপাতাল নতুন ভবন পেয়েছে। বহু নতুন বিভাগও যুক্ত হয়েছে। তেমনিভাবে, নতুন ভবনের ছাদের মাথায় বসানো ১০০০ লিটারের জল গরম করার নতুন সৌরশক্তির প্যানেল। হাসপাতালে পূর্ত বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার তাপস মজুমদার হিসেব দিলেন, ৫-৬ মাস যাবৎ এই সৌরশক্তির ইউনিট থেকে পাওয়া দৈনিক ১০০০ লিটার উষ্ণ জলের মধ্যে ৬০০ লিটার দিয়ে লেবার রুমের সারা দিনের প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়। তিনি বলেন, প্যানেলের সৌরশক্তি গ্রহণের সূক্ষ্ম ক্ষমতার কারণে সূর্যের আলোর হালকা আভাসেই জল গরম হয়ে যায়।

ত্রিপুরা রাজ্য শিল্প উন্নয়ন নিগম ও তাদের খাসতালুক বোধজংনগর শিল্প উপনগরীতেও ব্যবহৃত হচ্ছে মোট ১০০ কিলো ওয়াটের দু'টি সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প। এতে মোট খরচ হয় ৩ কোটি টাকা, ভারত সরকারের নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন মন্ত্রকের নিয়ম অনুযায়ী ৯০ শতাংশের মতো ছাড় দিয়ে প্রায় ১৩ লক্ষ টাকার মতো খরচ বহন করতে হয়েছে নিগম তথা রাজ্য সরকারকে। নিগমের জেনারেল ম্যানেজার শ্যামলকান্তি দেব জানালেন, ১০০ কিলোওয়াটের মধ্যে ৬০ কিলোওয়াটের প্ল্যান্ট বসেছে শিল্প তালুকের গ্রোথ সেন্টারে। বাকি চল্লিশ কিলোওয়াটের প্ল্যান্ট চলছে খেজুর বাগানের নিগম ভবনে। ছাদের প্যানেলগুলোর সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার কার্যকারিতা শুরু ২০১১-র প্রথম থেকেই। প্রায় দু'বছর ধরে ভারত সরকার অনুমোদিত সাইবারমোশন টেকনো প্রাইভেট লিমিটেড বিনা খরচে দেখভাল করছে। সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত সিনিয়র ইলেকট্রিশিয়ান নারায়ণ দেবনাথ জানালেন, উভয় ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ করে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে সক্ষম এই প্যানেলগুলো। বাকি ৪০ শতাংশ খরচ হয় ব্যাটারি চার্জ করতে। এ থেকে কার্যত দরকার গড়ে ২৫-৩০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ। যা দিয়ে ২০ থেকে ৪০ টা সিএফএল, ২০ টা টিউব লাইট, কম্পিউটার, গরমে পাখা ইত্যাদি অফিস চলাকালীন সময়ের পুরো চাহিদা সামলে দিতে পারে। তিনি জানালেন প্রচলিত শক্তিকে সম্পূর্ণত বাদ রেখে প্রতিদিন এ বাবদ প্রায় ২০ কিলোওয়াট সৌরশক্তি নিগম অফিসের কাজকর্ম চালু রাখছে।

এভাবেই আগরতলা পুর এলাকাকে সৌরশক্তি শহর পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়াও এগিয়ে চলেছে। এতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্রেডার আধিকারিক কল্যাণ আশিস করগুপ্ত জানালেন, এই পরিকল্পনায় ভারত সরকারের ৯০ শতাংশ ছাড়ের সুযোগটা অফিস, বাণিজ্যকেন্দ্র ছাপিয়ে ব্যক্তিগত স্তরে যুক্ত করার প্রস্তাব রয়েছে। ২০০৯-১০ এর নিরিখে ২০১৪-১৫ নাগাদ প্রচলিত শক্তি ব্যবহারের মাত্রা ১১০৬ মিলিয়ন ইউনিটে পৌঁছে যাবে বলে ধারণা করা যায়। পেট্রোল, ডিজেল, প্রচলিত বিদ্যুৎ, কেরোসিন, রান্নার গ্যাস এই সমস্ত উপাদান থেকে শক্তি খরচের দশ শতাংশ মানে ১১০.৬ মিলিয়ন ইউনিট সৌর শক্তি ও অন্য বিকল্প শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সাশ্রয়ের ভাবনা এতে থাকছে।

এই পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করার প্রাথমিক ধাপ হিসেবে বছর দেড়েক আগে, আগরতলার প্রধান পুর কার্যালয় সিটি সেন্টারের ছাদে বসেছে সৌরশক্তির প্যানেল। এই ৩০ কিলো ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার প্যানেল অবশ্য বিকল্প সহযোগীর ভূমিকা পালন করে চলেছে। এমনিতে ভাবনা হচ্ছে, সৌরশক্তিতেই কাজ চলুক। যদি উৎপাদন পর্যাপ্ত না হয় তো প্রচলিত শক্তি আছেই। লোডশেডিং হয়ে গিয়েছে। আগে লোডশেডিং হয়ে গেলে ইনভার্টার জেনারেটরই ভরসা ছিল। যদিও বর্তমান সময়ে প্রচলিত শক্তির বিদ্যুৎ না থাকলে (লোডশেডিং) সৌর শক্তি ৩০ কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ জোগানোর অনবদ্য ভূমিকা নিচ্ছে। ফলে সিটি সেন্টারের মতো বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক পর্যায়ের ব্যস্ততম ঠিকানা, যেখানে দৈনিক গড়পড়তায় কম করেও তিন-চার হাজার ব্যবসায়ী কর্মী, সাধারণ নাগরিকের যাতায়াতের বাধ্যবাধকতা সেখানে গ্রাউণ্ড ফ্লোর, ফার্স্ট ফ্লোর, থার্ড ফ্লোর ও ফোর্থ ফ্লোরে লোডশেডিংয়ের সময় সৌরশক্তির নিয়মিত ব্যবহার নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। দেড় বছর ধরে বিনা খরচে যে কোন সমস্যা নিরসনের সুবিধাসহ এই ঠিকানায় বহুমুখী সাশ্রয়ের মুখ দেখানো সৌর শক্তির প্যানেল বা গোটা প্ল্যান্ট টানা দু'বছরে কোন সমস্যায় পড়েনি যা খরচের দিক থেকে সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ।

লেম্বুছড়ার কলেজ অফ ফিশারিজ-এর পথে পথে সৌর বিদ্যুতের আলো। ইনসেটে ওই কলেজের ওয়াটার হিটার প্রকল্প চলছে সৌরশক্তিতে। ছবি—লেখক।

সৌর বিদ্যুতের ব্যবহারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লেম্বুছড়ার কলেজ অফ ফিশারিজ। ট্রেডার পক্ষ থেকে গত দু'বছরই কলেজের বয়েজ ও গার্লস হোস্টেলের ছাদে বসানো হয়েছে ৫০০ লিটার করে ৫ ইউনিট এর উষ্ণ জলের প্ল্যান্ট। সৌরশক্তির সাহায্যে এনার্জি মিটার যুক্ত গরম জলের এই ব্যবস্থাপনা মূলত বিনা খরচেই সুবিধে হিসেবে কলেজের পড়ুয়ারা পাচ্ছেন। একই সঙ্গে মাস দু'য়েক আগে 'সবুজ ভারত' অভিযাত্রার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের আরও বেশি পরিচয় করাতে কলেজ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২২ লক্ষ টাকা খরচে ট্রেডার পক্ষ থেকে বসানো হয়েছে ৭৫টি স্ট্রিট লাইট। ফিশারি কলেজের বিস্তীর্ণ চত্বরে সৌরশক্তির আলোতে রাতের আঁধার দূর করে ৩০-৩৫ ও য়াটের একেকটি সিএফএল। শহর এলাকায় সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারে মাত্র পাঁচটি দৃষ্টান্তের বাইরেও সৌর বিদ্যুতের কমবেশি ব্যবহার হচ্ছে।

প্রতিবেদকের অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে যে, সিংহভাগ ক্ষেত্রেই ধরে নেওয়া হয়েছে। সৌরালোকিত (এসপিইউ) প্লেটগুলো অবিরাম কাজ করে যাবে কিংবা প্ল্যান্ট থেকে ব্যাটারিতে আধান পরিবহন ও তদনুসারে আলো জ্বলে ওঠা ও চলবে যত্ন ছাড়াই। প্রয়োজনে সারাই মেরামত করার জন্য 'নিয়মিত' কোনও দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন নেই। ফলে কর্মী স্বল্পতায় নিয়ে চলছে যে 'ট্রেডা', তা কোনও প্রতিষ্ঠানের বিকল্প সৌর বাতি বা গরম জলের মেশিনটি সাথে সাথে ত্রুটিযুক্ত করতে পারে না। এভাবেই উপযোগিতা অপব্যবহারে বা অর্থের অপচয়ে রূপান্তরিত হয়। অর্থের অপচয়ে রূপান্তরিত হয়। যেমন, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ির পুষ্প উদ্যানের নষ্ট সৌরবাতিগুলো এবং আইজিএম হাসপাতালের জল গরম করার পুরনো ও নষ্ট সৌরযন্ত্র ও প্যানেলগুলো। এ দিকটায় সামান্য নজর দিতে পারলে সৌরবিদ্যুৎ অপচয় নয়, অবশ্যম্ভাবী রূপে অর্থ সাশ্রয়কারী ও কার্বন নিষ্ক্রমণের একটি অসমান্তরাল, নির্বিকল্প ঢাল হয়ে উঠবে।

নয়াদিল্লির সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট এর ফেলোশিপ নিয়ে গবেষণার অন্তর্গত পর্যবেক্ষণ থেকে এই প্রতিবেদন।